সুতীর্থ

জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা ও সম্পাদনা

গৌতম মিত্র

SUTIRTHA
A Bengali Novel by Jibanananda Das
Edited By Gautam Mitra

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-389-8

Price r 350

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আর্ট ক্রিয়েশন

দাম r ৩৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন -৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

ভূমিকা

'সুতীর্থ' উপন্যাসে একটি চরিত্র আরেকটি চরিত্রকে বলছে, '... এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি যা মুখে আসছে তা-ই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি?' আমার মনে হয় 'সুতীর্থ' উপন্যাসে পৌঁছনোর চাবিকাঠি এই কথোপকথন:

'ক্ষেমেশের এ সব দূর, অব্যয় কথা জয়তীর কানে ঢুকল না হয়তো। জয়তীর মনের ধাঁচ অন্য রকম তাতে নিবিড়তা আছে হয়তো কিন্তু পরিসর নেই, নিবিড়তাও বেশি নেই, সেটা নলকূপের; অর্জনের মতো বাণমুখের নয় যা ভোগবতীকে এনেছিল; কপিল সগরের মতো নয় যাদের বড় কোলাহলের ভেতর থেকে গভীরতার আনন্দ নিয়ে সাগরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তবুও খুব খাঁটি কথা বললে জয়তী।

'কলকাতায় এমন জায়গা আছে,' জয়তী বললে, 'যেখানে একটা কলে একশো পরিবারের জল-সংস্থান করতে হয়; তুমি যে ঘরে বসে একা একা চা খেয়ে লম্বা বাতেলা ছাড়ছ এরকম কামরা পেলে পঁচিশটে পরিবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে হেঁসেলে হাঁসফাঁস হয়ে মড়কের ইঁদুরের মতো সাবাড় হতে হতে ভাগাড়ের শকুনের মতো ছাপটা মেরে নেচে ওঠে আবার। এ তো মৃত্যু—কিন্তু তবুও জীবনও বটে। জীবন ছাড়া এ আর কী? এ জীবনকে জায়গা দিতে হবে।'

'তা দিতে হবে; কিন্তু এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি যা মুখে আসছে তা-ই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি?'

'বাংলা আমার ঠিকই আছে ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাইনে।'

'কাদের সঙ্গে মিশছ আজকাল তুমি?'

'যারা মানুষের সঙ্গে মেশে তাদের সঙ্গে।'

'তারা কি এ রকমভাবে কথা বলে?'

'তুমি অনেকদিন কারুর সঙ্গেই মেশনি। ভাষা ও চিন্তা কি রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে টের পাও না তুমি।...'

প্লটে জীবনানন্দ দাশের আস্থা ছিল না, তিনি মনে করতেন জীবন যেহেতু প্লটলেস, গল্প-উপন্যাসও তাই প্লটলেস হতে বাধ্য। জীবনানন্দ দাশের ভাষায়, 'প্লট নতুন—কিম্বা কোনও প্লটই থাকবে না, নতুন নভেলের মানুষদের গতিবিধির চেয়ে ভাবনা চিন্তার ওপরই জোর দেওয়া হবে বেশি কাজের চেয়ে কথার ওপর।'

ভাবতে অবাক লাগে যে চিন্তাভাবনা পঞ্চাশ দশকে পাশ্চাত্যে শুরু হয়েছে তা জীবনানন্দ দাশ ১৯৪৮ বা তার আগে ভাবলেন কীভাবে এই আত্মখনন, চেতনাপ্রবাহ, ভাঙচুর অস্তিত্ব নিয়ে খেলা আমরা তো জানি পঞ্চাশ দশকে ইউরোপে শুরু হয়েছিল। ফরাসি দেশে। নুভ্যো রোমাঁ। নতুন উপন্যাস। 'ল্য মোঁদ' পত্রিকায় এমলি অঁরিও ২২ মে ১৯৫৭-তে 'নুভ্যো রোমাঁ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। আল্যা রোব গ্রিইয়ে, মিশেল বুতো, নাথালি সারোত, মার্গেরিত দ্যুরাস, ক্লদ সিমোঁ, ফিলিপ সোলের প্রমুখের হাত ধরে যার যাত্রা শুরু। প্রচলিত উপন্যাসের কথক নিজেকে সর্বজ্ঞ ভাবে ফলত কাল ও স্থানকে এক অভিন্ন একক মনে করে। 'নতুন নভেল' এইভাবে না দেখে একটা ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখে, একটা ঘটনার অসম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তা তাকে বেশি টানে। মেটাফর বেশি ব্যবহার করে। পাঠক নিজেও একটা পাঠের সম্ভাবনায় ভাগ বসাতে পারে। আমরা দেখি মার্গেরিত দ্যুরাসের উপন্যাসে একই চরিত্র ঘুরেঘুরে 'একই কথা' বলার জন্য বিভিন্ন উপন্যাসে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে চায়। সংগীতের নির্দেশে তারা পুড়ে খাক হয়, আনন্দে পাতাল হয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশের গল্প-উপন্যাসেও এটা লক্ষ করা যায়। একই চরিত্র, ঘুরেঘুরে সেই একই কথা যেন বলে যায়। কত অবলীলায় জীবনানন্দ লেখেন 'মাখনের মতো বরফে ঢেকে যাচ্ছে, একটা থ্রাশ হয়তো কাঁদছে... তার পর বরফ তাদের খেই হারিয়ে ফেলল।' বরফের এই খেই হারানোর কথা জীবনানন্দের আগে বাংলা উপন্যাসে আর কেউ লেখেননি।

এই ভাষা মোকাবিলা করার জন্য বাংলার পাঠক ও সমালোচক প্রস্তুত ছিলেন না। তাই কেনও সমালোচকের মনে হবে, ''বোঝা যায়, 'সুতীর্থ' চরিত্র সম্পর্কে আগে থেকে লেখক সুষ্ঠু সুপরিকল্পিত ভাবে চিন্তা করে নিতে পারেন নি। লিখতে লিখতে ঘটনা সংস্থানের প্রয়োজনে চরিত্রটির নানা পরিচয় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এই পরিচয়গুলি একসঙ্গে দেখলে একটা পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তেমনটি ঠিক হয়নি। ঘটনার বাঁকগুলির প্রয়োজনে চরিত্রও বাঁক ফিরেছে কিন্তু সমস্ত চারিত্রিক বাঁকগুলির পারম্পর্যে নদীপ্রবাহের মতো অবিচ্ছিন্ন গতি নেই। এইজন্যেই কোনো চরিত্রই সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে হয় না। মনে হয়, অনেকখানি আরোপিত ও অসমঞ্জস। সুতীর্থর মতোই তার স্রষ্টার কল্পনাও খামখেয়ালি ও দায়িত্বহীন।'' (একটি নক্ষত্র আসে, অম্বুজ বসু)

'সুতীর্থ' উপন্যাসের প্রতিনায়ক সুতীর্থ। প্রতিনায়ক কেননা নায়ক হওয়ার মতো লক্ষ্মণ বা অলক্ষণ কিছুই তার নেই। তার গোটা অস্তিত্বটাই যেন অনস্তিত্বের আধারে আধারিত। একসময় লেখালেখি করলেও এখন সে লেখা ছেড়ে দিয়েছে। উপন্যাসের শুরুতেই এবিষয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'লেখা-টেখা সুতীর্থ অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছে। এর মানে এ নয় যে লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। দেশ-বিদেশের

সাহিত্যের ইতিহাস নেড়ে চেড়ে দেখলে অবিশ্যি জানা যায় যে বিখ্যাত লেখকরাও তাঁদের প্রতিভার তুষ-তাপও আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি-কয়েক বছর লিখে অনেকেই হার মেনে কলম থামিয়েছেন, কিংবা যা লিখেছেন তাকে সাহিত্যলেখ বলা চলে না। সুতীর্থ এ জিনিসটার মানে ঠিক বুছে উঠতে পারে না। তার ধারণা সৎ লেখক অবসর খুঁজে নিয়ে নিজের ভাবে বসবার সুযোগ পেলেই (জীবনের যে কোনো অধ্যায়ে) ধীরে ধীরে বড় জাতের লেখা সৃষ্টি করতে পারে।'

সে বিবাহিত না অবিবাহিত সেটাও উপন্যাসের শেষ অবধি জানা যায় না। তবে কী জানা যায়? জানা যায় সুতীর্থকে ঘিরে কিছু চরিত্রের অনর্গল, কিছুটা অসংলগ্ন আর কিছুটা যুক্তিহীন ভাবে যথোপযুক্ত সংলাপ। আপাতভাবে মনে হয় সুতীর্থর বাল্যবন্ধু সেলুনের নাপিত মধুমঙ্গল বা স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রফেসর ফরদিঙ্গেল ফাগুর্সন ম্যাক কার্কম্যানকে নিয়ে লেখক অযথা কালি খরচ করেছেন কিন্তু আমরা যদি জীবনকে দেখি, এমন অনেক পারম্পর্যহীন কাজ আমরা করে থাকি। আসলে জীবনানন্দ দাশ এক প্রতি-উপন্যাস লিখতে চেয়েছেন। যেখানে তথাকথিত উপন্যাসের সমস্ত নর্মস ভাঙা হচ্ছে। আমাদের হোর্খে লুইস বোর্খেসের কথা মনে পড়বে, লিখন এমন এক বৃত্ত যার কেন্দ্র সব জায়গায় রয়েছে কিন্তু পরিধি কোথাও নেই। 'সুতীর্থ' উপন্যাসে তাই সুতীর্থর মতো সমস্ত চরিত্রই কখন যেন নায়ক হয়ে ওঠে। সুতীর্থর বাড়িওয়ালি মণিকা, বন্ধু বিরূপাক্ষ, বিরূপাক্ষর স্ত্রী জয়তী, অফিসের বস মুখার্জি, জয়তির স্তাবক বা প্রেমিকা ক্ষেমেশ। ঘটনাও এখানে যুক্তি মেনে ঘটে না। মনে হয় এক নৈরাজ্যর জগত। উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েও সুতীর্থ অফিসের শ্রমিকদের ধর্মঘটে অংশ নেয় অথচ তার মধ্যে এক অনভূতিশূন্য নির্লিপ্ততা কাজ করে। এমনকি দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য মণিকাকে এক রাতের জন্য বসের কাছে নিয়ে যেতে চায়।

এমন ভাষা আমাদের কাছে জীবনানন্দের আগে অচেনা ছিল। 'সুতীর্থ' উপন্যাসে জীবনানন্দ লিখছেন:

''সুতীর্থ ঠাণ্ডা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'প্রায় সাত-আট বছর বয়সে আমি কাজে নেমেছি। নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য সব জায়গায় চলে যেতুম। আমার বাপ-মা ভাই-বোন নয়, আমাকে ঘিরে অন্য যেসব ছেলেমেয়েরা থাকত তাদের কাছ থেকে আমি মন্ত্রগুপ্তি পেলুম যে, ইস্কুল কলেজ কিছু নয়—বাঙালী ছেলের পক্ষে দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। আমাদের দলের তিরিক্ষে সরপুঁটির মতো রূপমতী একজন মেয়েও এই কথা বলেছিল আমাকে বলবার কি ঠাঁট। কি ওজন। আহা। প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ বছর আগে গুলি খেয়ে সেই মেয়েটি মরে গেছে—আজো যখন তার কথা মনে হয়' সুতীর্থ ক্ষেমেশের জয়তীর চার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়েও আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে, 'আমি তখন খুব ছোট ছিলুম, আট নয় বছর বয়স হবে, সেই মেয়েটির পনেরো ষোল, আমাকে চুমো খেয়ে খেয়ে পুদিনা পাতা মরীচ তেঁতুল আর লবণের যে পাঞ্জাবী চাটনী বানাত—উফ। যখনি এর পরে একা পড়ে যেতুম, আমাকে কোলে টেনে মাইয়ের ওপর নিয়ে যেত সে; এমনই ন্যাতা জোবড়া মনে হত, এত বিরক্তি লাগত, এত রাগ হয়েছিল একবার যে নখ দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছিলুম তার নাক মুখ—'

সুতীর্থ একটা ঢোঁক গিলে বললে, 'মানুষের ইচ্ছা খুব দেরিতে আসে, তার ভালোবাসাও; আট ন'বছরের একটা কুকুর তো ছেলেপুলের ঠাকুর্দা, কিন্তু ন'বছর বয়সে সেই মেয়েটিকে আমি ভালোবাসলেও ওরকম টানাহেঁচড়া পছন্দ করতুম না। শিবের মাথার সিন্দুর ছিলুম। তিনচারজন বেশ রায় রায়ান গোছের পুরুষও ছিল সেই বিপ্লবীদের দলে, খুবই শ্রদ্ধা করতুম তাদের; ভালোবাসতুম মেয়েটিকে, কিন্তু তবুও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রিভলভার চালিয়ে ইংরেজ খুন করে দেশকে স্বাধীন করবার যে সব পথ দেখিয়ে দিত তারা, যে সব মোক্ষম জবানী ঝাড়ত আমি সে সব মোটামুটি বিশ্বাস করলেও প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করিনি কিছু, ক্ষেমেশ—' "

মে-জুন ১৯৪৮-এ লেখা হলেও, জীবৎকালে তো নয়ই, মৃত্যুর ২২ বছর পরে, ৩ জানুয়ারি থেকে ১৩ সেপ্টেম্বরের ১৯৭৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে 'দেশ' পত্রিকায় 'সুতীর্থ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পর্বের সঙ্গে জনৈক অভিনন্দ (ছদ্মনাম?)-র একটি ভূমিকা ছিল। ভূমিকাটি দুষ্প্রাপ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলে এখানে তা তুলে দিলাম:

''রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দই যে বাংলা কবিতায় সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন এ কথা কবিরাই বলে থাকেন। বিশেষ করে পরবর্তী কবিরা যারা পঞ্চাশ বা ষাট থেকে কাব্যচর্চা শুরু করেছেন। জীবনানন্দই বোধ হয় একমাত্র কবি যিনি পরবর্তীকালে সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন, যাঁর জনপ্রিয়তা কবি হিসেবেই গত পঁচিশ তিরিশ বছরে অনেক বেড়ে গিয়েছে। কান গুণে, কী মন্ত্রে তিনি এই কাব্যপাঠে অনিচ্ছুক বাঙালী বৃহত্তর পাঠকসমাজকেও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন সে-প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান এটা নয়। আর তাঁর কাব্যালাচনা অন্যে করেছেন, অন্তত বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের কাব্যের যে আলোচনা করেছেন তার তুলনা নেই।

জীবনানন্দর অল্প কিছু গদ্য রচনা-গল্প ও উপন্যাস আমার আলোচ্য বিষয়। আমরা জানি, যিনি কবি তিনি শুধু কাব্য রচনাই করবেন এমন কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। বরং সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, কাব্য রচনা ছাড়াও কবিরা অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করেছেন। বিদেশে তো বহু, স্বদেশেও আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই যিনি সাহিত্যের সকল মাধ্যমেই তাঁর অবিশ্বাস্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তবু এমন মনে হতে পারে, সকলেই গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথ নন, কাজেই প্রতিভার তারতম্য রয়েছে সর্বদিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা সত্ত্বেও এক একজন এক একটি মাধ্যমকেই আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে সার্থক বাহন হিসেবে আবিষ্কার করে নেন।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, কবিতাকেই জীবনানন্দের 'প্রথমা' বলা হয়েছে। সম্ভবত প্রথমা কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল, জীবনানন্দের কাব্য বিষয়ে গভীরতম অনুরাগ ও কাব্যে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিহার বোঝাতে। এ বিষয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই, কেননা জীবনানন্দ কবিতাকেই তাঁর অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর মনোজগৎ, তাঁর অভ্যন্তর চেতনা কাব্যে পরি-পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কবি

তাঁর কাব্য রচনার সেই সিদ্ধির যুগেই কিছু কিছু, গদ্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কেন দিয়েছিলেন এ প্রশ্ন সাধারণ লেখকের বেলায় হলে তার একটা সহজ উত্তর থাকত আমরা বলতে পারতাম, শখ করে। জীবনানন্দের বেলায় সে কথা বলা যায় না, যেমন বলা যায় না পিকাসো কেন একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। জীবনানন্দর গল্প উপন্যাস রচনার কারণ হিসেবে ডঃ অমলেন্দ, বসু, চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'বহুদা-বিভক্ত আধুনিক চিত্তের, জটিলতা এতই অচ্ছেদ্য, এতই দুর্জয় যে মাত্র একটি শিল্প মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে শিল্পী সন্তোষ বোধ করেন না, তাকে ছুটে যেতে হয় নুতন নুতন শিল্পকর্মে, তাঁকে নিরত থাকতে হয় নুতন নুতন শিল্প মাধ্যমের নিরীক্ষায়।..... তাঁর কবিতায় (আমরা) পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করি, তবুও মনে হয় তিনি স্বয়ং হয়তো কোথাও সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান বোধ করে-ছিলেন এবং বোধ করেছিলেন বলেই কবিতা ছাড়াও কথাসাহিত্য রচনায় কিছুটা আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন'

অমলেন্দুবাবুর এই ব্যাখ্যার বাইরে আরও কিছু যোগ করা যায় হয়ত, তিনি নিজেও 'মালাবান'-এর ভূমিকায় আরও বিস্তৃত করে কথাটি বোঝাতে পেরেছেন-কিন্তু আপাতত আমরা মেনে নিচ্ছি, কবি কোথাও কোথাও অনুভব করেছিলেন, তদ্রূপ উপন্যাস রচনা ছাড়া 'বস্তুনিষ্ঠ সময়চেতন বহির্জগতের অন্তত আংশিক প্রকাশ' ঘটানো সম্ভব নয়।

এই চিন্তা, বা দ্বিধার দরুন জীবনানন্দ কয়েকটি গল্প উপন্যাস লেখেন। গল্পের সংখ্যা তিন। ছায়ানট, গ্রাম ও শহরের গল্প, বিলাস। তিনটি গল্পই 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পগুলি মোটামুটি ত্রিশের দশকেই লেখা। এর পর দীর্ঘকাল জীবনানন্দ কোনো গদ্য রচনা করেছেন কিনা আমি জানি না। তাঁর 'মাল্যবান' উপন্যাসের রচনাকাল জুন ১৯৪৮ সাল। ধরে নিতে পারি এক যুগ তিনি আর গল্প উপন্যাস রচনায় হাত দেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে, দেশ বিভাগের পর জীবনানন্দ যেন অকস্মাৎ পর পর দুটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রথম রচনাটি মে-জুন মাসে ১৯৪৮ সালেই লেখা হয়। নাম 'সুতীর্থ'। দ্বিতীয়টিও জুন মাসে, ওই একই সালে। দ্বিতীয়টির নাম 'মাল্যবান'। এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। বলা বাহুল্য, কবির প্রথম উপন্যাস 'সুতীর্থ' এতকাল আমাদের অগোচরে ছিল। সম্প্রতি তা দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ-যিনি বহন যত্নে এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর কিছু বক্তব্য এখানে নিবেদন করি। অশোকানন্দ বলেছেন:

''জীবনানন্দ দাশের প্রথম উপন্যাস 'সুতীর্থ' ১৯৪৮-এর মে-জুন-এ লেখা। প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৭৬-এ। এই দীর্ঘকাল তাঁর উপন্যাস অপ্রকাশিত হয়ে থাকার একটা ইতিহাস আছে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর রচনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত 'কবিতা' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি গল্প ও কবিতা তখন প্রকাশিত হয় এবং সিগনেট প্রেস থেকে 'রূপসী বাংলা' ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বের হয়।

পরিমার্জনা কিন্তু উপন্যাসগুলো প্রকাশ সম্বন্ধে কী তাঁর কল্পনা-ভাবনা, সম্বন্ধে কিই বা তাঁর চিন্তা ছিল সবই অব্যক্ত থেকে গেছে। তাই এগুলো প্রকাশে আমার কিঞ্চিৎ সংকোচ ছিল। 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং 'মাল্যবান' উপন্যাসটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বসুকে আমি পড়তে দিয়েছিলুম। তাঁরা দুজনেই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। রচনাগুলি আমার কাছে থাকলেও এগুলি প্রকাশ করবার অধিকার ছিল তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্য দাশের অনুমতিসাপেক্ষ। সাহিত্যিক বা পাঠক সমাজ কবির উপন্যাসগুলি কেমনভাবে গ্রহণ করবেন এ সম্বন্ধে দ্বিধা থাকার দরুনই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক তিনি দীর্ঘকাল এই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করবার অনুমতি দেননি। ১৯৭৩ সালে আমার ভগ্নী শ্রীমতী সুচরিতা দাশের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁর কাছ থেকে উপন্যাস প্রকাশের অনুমতি লাভ করি। কালবিলম্ব না করে তাঁর ছোট উপন্যাস 'মাল্যবান' প্রকাশিত হয়।

একথা বললে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে 'মালাবানের' প্রচ্ছদপট অঙ্কনের সময় মাল্যবানের প্রুফ পড়ে শ্রীসত্যজিৎ রায় এত মুগ্ধ হন যে তিনি জীবনানন্দের সমস্ত অপ্রকাশিত উপন্যাস প্রকাশের জন্য বারংবার আমাকে অনুরোধ করেন। আমরাও এ বিষয়ে পুনরায় সচেষ্ট হই।

কিন্তু, ছোট ছোট অক্ষরে দ্রুত লিখনের জন্য জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য নয়। কোথাও লাইনের দাগ আছে, কোথাও দুটি শব্দ নীচে পাশা-পাশি আছে, যে পাঠ আমাদের অধিকতর উপযোগী মনে হয়েছে তাই আমরা গ্রহণ করেছি। জীবনানন্দের উপন্যাস প্রকাশনার দীর্ঘ বিলম্বের জন্য সাহিত্যিক সমাজের কাছে আমার যে কৈফিয়ৎ দেয় ছিল, তা এই।"

আমরা জানি জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রকাশিত তিনটি গল্প এবং 'মাল্যবান' ও 'সুতীর্থ' উপন্যাস আর 'রূপসী বাংলা' ভূমেন্দ্র গুহ পাণ্ডুলিপি থেকে কপি করেছিলেন অথচ 'দেশ' পত্রিকার ভূমিকায় কোথাও তার উল্লেখ নেই। ভূমেন্দ্র গুহ ২০০১-এ প্রকাশিত 'সুতীর্থ'-র ভূমিকা লিখলেন তখন আমরা 'সুতীর্থ' উপন্যাসের নেপথ্যের অনেক অজানা কাহিনি জানতে পারলাম। তাই ভূমেন্দ্র গুহর ভূমিকাটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তার নির্বাচিত কিছু অংশ তুলে দিলাম:

''জীবনানন্দর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'মাল্যবান', প্রকাশিত হয়েছিল খ্রি. ১৯৭৪-এ। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস 'সুতীর্থ', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশ করেছিলেন খ্রি. ১৯৭৭-এ; সাদাসিধে একটি প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। বোছাই যায়, কোনো এক রকম অনুরোধ-উপরোধ এড়াতে না পেরে প্রকাশক মহাশয়রা পুস্তকটি প্রকাশ করেছিলেন, কেননা বইটির প্রকাশনা শৈলীতে অবহেলার ছাপ অপ্রচ্ছন্ন নয়, জীবনানন্দর গদ্যরচনার পাঠকসংখ্যা তখন নিশ্চয়ই আরও অপ্রচুর ছিল। প্রথম প্রকাশকদের ঘর থেকে বইটির কোনো দ্বিতীয় মুদ্রণ আর প্রকাশিত হয় নি। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগের বছরেই অবশ্য 'দেশ'-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল।

দশটি ছাত্রব্যবহার্য এক্সারসাইজ খাতার পাতায় এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি নিবদ্ধ ছিল। খ্রি. ১৯৬৬-এ 'মাল্যবান'-উপন্যাসের দ্বিতীয় প্রেসকপিটি যখন অনুরূপ চারটি খাতার পাণ্ডুলিপি থেকে তুলে এনে তৈরি করা শেষ হল, এবং জেলার হাসপাতালে চাকরি করতে যাওয়ার আগে কলকাতায় থেকে যাওয়ার সুযোগ খ্রি. ১৯৬৮-র জুলাই মাস পর্যন্ত নানা রকম ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণে বর্ধিত হতে পারল, তখন সেই প'ড়ে-পাওয়া সময়টুকুতে যত রকম অডাক্তারি কাজ করেছি বা করতে বাধ্য, হয়েছি, তার মধ্যে একটা হল 'সুতীর্থ'-উপন্যাসের প্রেসকপিটি তৈরি করা; এই কাজটিই ছিল তখন এক মাত্র সানন্দ সাগ্রহ সময় উদ্যাপনের কাজ। 'মাল্যবান'-এর মতোই 'সুতীর্থ' ছিল জীবনানন্দর শেষ চারটি উপন্যাসের একটি, ফলত পাণ্ডুলিপিটি টাটকা ও অভঙ্গুর কাগজে লেখা; মোটা নিবের কলমের গোটা-গোটা হস্তাক্ষরে লেখা বলে প্রায়শই সহজে বোধগম্য; পরিমার্জনা-পরিবর্তনের মাত্রা খুব বেশি ছিল না; যা-ও বা ছিল, দীর্ঘ কালাতিপাতের প্রভাবে তা তেমন ভাবে মলিন হয়ে যায় নি ব'লে তার পাঠোদ্ধার ও রচনার ভিতরে তার স্থাননির্দেশও তুলনামূলক ভাবে বেশ সরল ছিল। প্রেসকপি তৈরি করার জন্য দ্বিতীয় প্রয়াস হিসেবে উপন্যাসটিকে বেছে নেওয়ার মধ্যে যে কোনও পরিকল্পনা ছিল, তা নয়; ট্রাঙ্কের মধ্যে তাঁর উপন্যাসের খাতার থাকে উপরের দিক থেকে 'মাল্যবান'-এর পাণ্ডুলিপির চারটি খাতার পরেই 'সুতীর্থ'র খাতাগুলি ছিল, সুতরাং 'সুতীর্থ'ই ক্রমান্বয়ের হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়েছিল।

কপি করা যখন শেষ হল, তখন প্রকাশিত করার প্রশ্নটাও সামনাসামনি এসে পড়ল। 'দেশ'-পত্রিকার সে-সময় সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে খুব একটা হাঁকডাক ছিল, পাঠক আশীর্বাদধন্য অনেক সাহিত্যিকই তখন 'দেশ'-এর হাত ধ'রে তাঁদের যাত্রা শুরু করছেন, আর পাঠক আনুকূল্য যখন যে-কোনো লেখকেরই অভিপ্রেত না হয়ে যায় না, সুতরাং আমরাই বা তা জীবনানন্দর জন্য কেন কামনা করব না। জীবনানন্দর অব্যবহিত আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এবং তাঁদের 'জয়যাত্রায় যাও গো'-ধরনের এক রকমের আশীর্বাদ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে একদিন গিয়ে আমি হাজির হয়েছিলুম, প্রেসকপিটি হাতে-ছোলানো ব্যাগের খাপে পুরে নিয়ে, অশোকানন্দর একখানা চিঠি হাতে ক'রে, খোদ সাগরময় ঘোষের কাছে। সাগরময় তখন তাঁর হাতের ম্যাজিকে রুমাল থেকে বেড়াল বার করার মতো অনায়াসে অনামা থেকে খ্যাতনামা লেখক তৈরি ক'রে দিতে পারেন, এমন সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন যথোপযুক্ত উদাহরণসাপেক্ষেই; আমরা জীবনানন্দর উপন্যাস-সাহিত্যের বিষয়ে তাঁর সেই অতুলনীয় বদান্যতা আন্তরিক ভাবে যাঞ্চা করেছিলুম। এবার আর আমরা অমলেন্দু বসুকে 'সুতীর্থ'র প্রেসকপি দেখাতে গেলুম না; তাঁর কৃপায় 'মাল্যবান'-এর প্রেসকপি দু'বার তৈরি করতে গিয়ে ক্ষোভমিশ্রিত পরিশ্রমের ধাক্কায় আমার আক্কেল দাঁতগুলি সব পরিপূর্ণ বিকশিত হতে পেরেছিল। 'মাল্যবান'-উপন্যাসটির 'দেশ'-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার দাবি 'সুতীর্থ'র অগ্রবর্তী হলেও উপন্যাসটির কপালে সে-সার্থকতা পরিপূরিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই চড়চড় করেছিল, কেননা কবি পত্নী 'মাল্যবান'-এর প্রকাশে সম্মত ছিলেন না।

‘সুতীর্থ’র বেলায়ও তাঁর সম্মতি পাওয়া যেত কী যেত না, ভাবি নি, কিন্তু যেহেতু ‘সুতীর্থ’র কাঠামোতে উৎপলার মতো কোনও চরিত্র নেই, তাই ভাবা হয়েছিল যে, তিনি উপন্যাসটিকে প্রকাশিত হতে দিতে আপত্তি না-ও করতে পারেন, প্রকাশিত হওয়ার পরে সে-রকম অবস্থা উৎপন্ন হলে দিদি (সুচরিতা দাশ) সামাল দেবার ভার নিতে পারবেন; আমরা অমলেন্দু বসুকে যেমন পাণ্ডুলিপি দেখাতে গেলুম না, কবিপত্নীকেও তেমনি আগাম জানালুম না কিছু।

কিন্তু মানতে তো হবে যে আমরা কাজটা খুব ন্যায়সম্মত ভাবে করতে যাচ্ছিলুম না। সাগরময় আমাদের এই কর্মের অন্যায়ের ও অসৌজন্যের দিকটা থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ‘সুতীর্থ’র প্রেসকপি হাতে নিয়ে যখন পৌঁছুলুম এবং যথোচিত বিনয়পুরঃসর অশোকানন্দর চিঠিটি তাঁর হাতে দিলুম, তিনি তাঁর চেহারার স্বাভাবিক রাশভারি ব্যক্তিত্ব-জনিত দূরত্বকে অতিক্রম করেছিলেন, এবং আমাকে দু’-চারটে সৌজন্যসম্মত স্নেহাসিক্ত কথা বলেছিলেন। বিস্মিতও তিনি কম হন নি শুনে যে, জীবনানন্দও গল্প-উপন্যাস লিখেছেন; গল্পও লিখেছেন এবং তাঁর তিনটি গল্প দশ বছরেরও বেশি সময় হল প্রকাশিতও করেছি আমরা এই খবর শুনে তাঁর বিস্ময়বোধ এতটাই নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছিল যে, তা প্রায় অবিশ্বাসের রঙে চুপে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তিনি উপন্যাসটি প’ড়ে দেখবেন, এবং তাড়াতাড়িই প্রকাশযোগ্যতা বিষয়ে জানিয়ে দেবেন। ‘দেশ’-পত্রিকা জীবনানন্দর অনেক কবিতা ছেপেছে, সম্মান-জ্ঞাপক ভাবেই ছেপেছে, প্রবন্ধ ছেপেছে একাধিক, সুতরাং উপন্যাসটিও যে বেরোতে যাচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে, বা কোনও এক বিশেষ সংখ্যায় এক সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে-এ-বিষয়টা যেন স্বতঃসিদ্ধই, এই রকম একটা বিশ্বাসে ভর ক’’রে আমি বেশ একটা ফুরফুরে মেজাজে ‘দেশ’-পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লুম। পরীক্ষায় পাশ দেবার পরেও প্রায় দু’বছর হল আমার চাকরির বিষয়ে কোনও একটা সদ্গতি হচ্ছে না, হাজার ঘোরাঘুরি ধরাধরির পরেও, সেই অবমাননার অন্তঃশীল দুর্বহ চাপটাকে নিমেষে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আমি নিজেই নিজের পিঠ প্রশয় দেবার মতো ক’রে চাপড়ে দিলুম, তৎসত্ত্বেও একটা ভালো কাজ করেছি ব’লে, ‘সুতীর্থ’টা কপি করেছি ব’লে।

অশোকানন্দ বললেন, আগে বেরোক তো, তারপরে এত সব উচ্ছ্বাসের কথাবার্তা বলো। দিদি আমার সঙ্গে একমত হতে দ্বিধা করেন নি যে, উপন্যাস-লেখক জীবনানন্দর জন্মলাভ হতে যাচ্ছে এবার তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড় দশক পরে। তাঁর প্রধান আশঙ্কার ব্যাপারটা এই হয়ে উঠল যে, প্রকাশিত হওয়ার পরে, বড়ো-বৌদির প্রতি যে-অবিনয় দেখানো হয়েছে, তার উত্তরফল তিনি সামলাবেন কী ক’রে, এখন থেকেই কি প্রক্রিয়াটা কোনও ভাবে শুরু করে দেওয়া উচিৎ হবেল কিন্তু সাগরময় বাঁচালেন, তাঁর দপ্তর থেকে চিঠি আসতে খুবই দেরি হতে লাগল।

এই দেরিটা শনৈঃ-শনৈ এতই প্রসারিত হতে লাগল যে, আমাদের প্রায় জানাই হয়ে গেল, উপন্যাসটা আর বেরোচ্ছে না। অশোকানন্দকে ফোন ক’রে এত্তেলা দিতে কয়েক বারই বলেছিলুম, তিনি তার বদলে আমাকে একদিন বললেন, তুমিই আগ

বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলে, তুমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসোল দ্বিতীয় বার আবার এত বড়ো উপন্যাসটা কপি করতে হবে না। তো-ন্যাড়াকে বেলতলায় আবার যেতে হতে পারে তাহলে সম্ভাবনাগুলি আমার মাথার ভিতরে আলেয়ার মতো নেচে বেড়াতে লাগল। আমি আবার একদিন গিয়ে সাগরময়ের আরাম-কেদারায় প্রতিষ্ঠিত ভারি শরীরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, আটষট্টির জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে হবে। বেশি কথা বাড়াবার আগেই ব'লে দিলেন, ম্যানাসক্রিপটা আপনি নিয়ে যান, অশোকবাবুকে বুছিয়ে বলবেন 'দেশ' ঠিক এ-ধরনের উপন্যাস ছাপতে চায় না, তা ছাড়া লেখাটা উপন্যাস হয়ও নি। আমরা জীবনানন্দর কবি-পরিচয়েই সুখী আছি, তাঁর কবিতা পেলে অবশ্যই ছাপব। কী আর করি আমি, 'দেশ'-পত্রিকার চওড়া লেফাপায় মোড়া কপির খাতা ক'খানি যত্নআত্তি ক'রে হাতে-ঝোলানো ব্যাগের খাপের ভিতর ভ''রে নিলুম আবার, সাগরময়ের সামনের টেবিলের এ-দিকের চেয়ারে এক বার বসবার সুযোগও হল না আগের বারের মতো, আমি হাত তুলে একটা শুকনো নমস্কার ঠুকে পেছন ফিরলুম। ব্যাপারটা এই ভাবেই মধুরেণ সমাপ্ত হবে মেজদা যেন জানতেনই, তিনি নিস্তরঙ্গ হয়ে রইলেন, দিদি ক্ষণিকের জন্য মনমরা হলেন একটু, শুধু আমার মনের মধ্যে কাঁটার মতো এই কথাটা বিঁধতে লাগল যে, জীবনানন্দর লেখা কপি করার পরিশ্রমে যে পরিপ্লুত আনন্দ নিভু আঁচে উপভোগ করা যেত এত দিন, তা এবার শেষ হল।

তারপরে জীবনানন্দর খাতা-ভরতি ট্রাঙ্কগুলি ত্রিকোণ পার্কে ফিরে গেছে, কপি-করা পান্ডুলিপিগুলিও, খ্রি. ১৯৬৮-র জুন-জুলাইয়ের কোনও সময়ে। আমার সঙ্গেও সম্পর্ক তাদের ছিন্ন হয়ে থেকেছে এই সেদিন পর্যন্ত।'

এই হল 'সুতীর্থ' উপন্যাস প্রকাশের ইতিহাস। আমরা মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে যতটা সম্ভব অসঙ্গতিগুলো দূর করার চেষ্টা করেছি। বানানরীতির ক্ষেত্রে সমসাময়িক রীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকাশক সন্দীপ নায়ক যে আমার ওপর ভরসা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। তিনি এক এক করে জীবনানন্দ দাশের সমস্ত রচনাবলি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। জীবনানন্দপ্রেমী সমস্ত পাঠক এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

উপন্যাসগুলিতে আধুনিক বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে; বিকল্প পাঠের ক্ষেত্রে আমরা জীবনানন্দ দাশের জীবৎকালে পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত পাঠের ক্ষেত্রে স্বয়ং লেখক যে রীতি অনুসরণ করেছেন তা গ্রহণ করেছি।

৮ জানুয়ারি ২০২৬ গৌতম মিত্র

[illegible] 'শিস দিয়ে — [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

'তুমি সুতপা!'

'আমরা আছি।' [illegible]

[illegible]

[illegible] না?'

'না তো।'

'কেন?' [illegible]

[illegible]

এক

লেখা-টেখা সুতীর্থ অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছে। এর মানে এ নয় যে লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ইতিহাস নেড়েচেড়ে দেখলে অবিশ্যি জানা যায় যে বিখ্যাত লেখকরাও তাঁদের প্রতিভার তুষ-তাপও আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি— কয়েক বছর লিখে অনেকেই হার মেনে কলম থামিয়েছেন, কিংবা যা লিখেছেন তাকে সাহিত্যলেখ বলা চলে না। সুতীর্থ এ জিনিসটার মানে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার ধারণা সৎ লেখক অবসর খুঁজে নিয়ে নিজের ভাবে বসবার সুযোগ পেলেই (জীবনের যে-কোনও অধ্যায়ে) ধীরে ধীরে বড়ো জাতের লেখা সৃষ্টি করতে পারে।

নিজে অনেকদিন থেকে কিছু লিখছে না বটে কিন্তু সেটা অক্ষমতার জন্যে নয়, অবসরের অভাবে। অর্থের সচ্ছলতা নেই। এই নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিন-রাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনের শান্তিসমতা যায় নষ্ট হয়ে; চাকরির থেকে ফিরে এসে হাতে সময় যে না থাকে তা নয়, কিন্তু তখন শরীর অবসন্ন, মন ধাতে নেই। সে মনকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব নয়, কিন্তু সময় লাগে, সহিষ্ণুতা চাই, সুযোগেরও প্রয়োজন। পিতৃপুরুষ কোনও দিক দিয়েই এমন কোনও সংস্থান করে যাননি সুতীর্থের জন্যে যে অফিস থেকে সন্ধ্যায় ভাড়াটে ফ্ল্যাটে ফিরে মন তার সমস্ত দিনের অপব্যবহার ও সমস্ত রাতের দুশ্চিন্তার সংযোগলোকে দু-চার মুহূর্তের জন্যে এমন একটা সহজ স্বাভাবিক আশ্রয় খুঁজে পাবে যেখানে শিল্প-সাহিত্যের আলো আসে মনে, লিখলেও তা হয়ে দাঁড়ায় যা চাওয়া যায় মোটামুটি তা-ই। এ কি সম্ভব কখনও? এক-আধবার অবশ্য চেষ্টা করে দেখেছে সে, টের পেয়েছে ক্ষমতা আছে কিন্তু অনেক সহিষ্ণুতার সুযোগ তৈরি করে নিয়ে দু-চার